রংপুরের সফল নির্বাচনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় করণীয়

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১১ জানুয়ারি ২০১৮)

সকল পর্যবেক্ষকের মতেই সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রংপুরের সিটি করপোরেশন নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এতে ভোটার তালিকা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি, অর্থাৎ মনে হয় যেন রংপুরে সকল এলিজেবল বা ভোটার হবার যোগ্য ব্যক্তি ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পেরেছেন। যারা প্রার্থী হতে চেয়েছেন তারা প্রার্থী হতে পেরেছেন। ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল, অর্থাৎ নির্বাচনটি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। এই নির্বাচনে ভোটারগণ কোনোরূপ ভয়-ভীতির উর্ধ্বে ওঠে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। নির্বাচনে কোনো সহিংসতা ঘটেনি। ভোটগুলো সঠিকভাবে গণনা হয়েছে। পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিই ছিল মোটামুটি স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য। রংপুরের নির্বাচনকে তাই, আন্তর্জাতিক আইনের ভাষায়, 'জেনুইন ইলেকশান' বা সঠিক নির্বাচন বলা চলে।

রংপুর সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার অন্যতম কারণ হল সেখানে নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা প্রদর্শন এবং জন আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কমিশন ৩৩ জন নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ৩৩টি এবং বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে ১১টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেছে। এছাড়াও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাড়ে পাঁচ হাজার সদস্যকে মোতায়েন করেছে।

সর্বোপরি রংপুরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রশাসন তথা সরকার দায়িত্বশীল আচরণ করেছে। রাজনৈতিক দলগুলোও সদাচারণ করেছে। একইসঙ্গে এ নির্বাচনে গণমাধ্যম ওয়াচডগের ভুমিকা পালন এবং নাগরিক সমাজও ব্যাপক সক্রিয়তা প্রদর্শন করেছে। যেমন, 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' এবং পিস অ্যাম্বাসেডরদের উদ্যোগে রংপুরে মেয়র পদপ্রার্থীদের এবং অন্য ১৫টি ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের নিয়ে 'ভোটার মুখোমুখি' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে হাজার হাজার ভোটার অংশ নিয়েছেন। এসব অনুষ্ঠানে হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের শিক্ষা, পেশা, আয়, সম্পদ, দায়-দেনা, মামলা ও আয়কর ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যের তূলনামূলক চিত্র তৈরি করে বিতরণ করা হয়, যাতে ভোটারগণ তথ্যের দ্বারা ক্ষমতায়িত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এসব অনুষ্ঠানে প্রার্থীগণ নির্বাচনে কারচুপি, টাকার খেলা এবং পেশিশক্তি ব্যবহার থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার লিখিতভাবে করেন। পাশাপাশি উপস্থিত ভোটারগণও সৎ, যোগ্য, জনকল্যাণে নিবেদিত এবং সহিংসতায় লিপ্ত নন এমন প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার শপথ গ্রহণ করেন। এছাড়াও 'সুজন'-এর একটি স্বেচ্ছাব্রতী সাংস্কৃতিক দল নগরের আনাচে-কানাচে ভোটারদেরকে সচেতন করেন। এ নির্বাচনে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করেও (facebook.com/shujan.bd) ভোটারদের মধ্যে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করা হয়। আর নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের তথা সকল অংশীজনের ইতিবাচক ভূমিকার সুফলই আমরা পেয়েছি রংপুর সিটি নির্বাচনে।

গ্রাম বাংলায় বহুল প্রচলিত প্রবাদ ব্যবহার করে বলতে গেলে, রংপুরে সাত মন ঘি জুটেছে, তাই রাধাও নেচেছে। অন্য সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি করা গেলেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা যাবে। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের ওপর নির্ভর করে না, যদিও এর জন্য কমিশনের ভুমিকাই সর্বাধিক। বস্তুত, নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা, নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য (necessary) হলেও, তা যথেষ্ট (sufficient) নয়। আরও সুস্পষ্টভাবে বলতে গেলে, সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনও সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারবে না, যদি না সরকার ও রাজনৈতিক দল সদিচ্ছা প্রদর্শন এবং দায়িত্বশীল আচরণ না করে। তাই রংপুরের নির্বাচন মানুষের মধ্যে আশাবাদ সৃষ্টি করলেও, তা থেকে আগামী নির্বাচনগুলো, কেমন হবে তার কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে না।

রংপুরের নির্বাচন শুধুমাত্র সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষই হয়নি, নির্বাচনটি ছিল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ। আর এ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবার পেছনে ছিল নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা। নির্বাচন যখন অস্বচ্ছ, কারচুপিপূর্ণ ও বিতর্কিত হয়, তখনই সাধারণত সহিংসতা সৃষ্টি হয়। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ওপর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভর করে। আর রংপুরের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল বলেই তা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছ।

এছাড়াও প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন সাধারণত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ হয়। রংপুরের নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো – আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি – প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিল বলেই নির্বাচন কারচুপিমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ হবার পথ প্রশস্ত হয়। তাই ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলো গ্রহণযোগ্য করতে হলে সেগুলোকে সব বড় দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রবল প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে হবে।

তবে রংপুরের সফল নির্বাচনের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা অন্যান্য সিটি করপোরেশন নির্বাচনে রক্ষা করা গেলেও, সংসদ নির্বাচনে তার পুনরাবৃত্তি করা যাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ স্থানীয় সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় না। পক্ষান্তরে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল হয়। তাই জাতীয় নির্বাচনের সমীকরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর আমাদের দেশের 'বিজয়ীদের

সবকিছু করায়ত্তে'র (winer-take-all) সংস্কৃতিতে যেকোনো মূল্যে নির্বাচনে জেতার এক অশুভ প্রতিযোগিতা বিরাজমান। রাজনীতিতে দমনপীড়নের উপস্থিতিতে এ অশুভ প্রতিযোগিতা মরণপণে পরিণত হয়। তাই আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল মরণপণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলে আমরা আশ্চার্যান্বিত হব না। তাই ঢাকাসহ আগামী ছয়টি সিটি করপোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হলেও আগামী একদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে তা কোনোভাবেই নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং তার প্রেক্ষাপট থেকেও আমরা এব্যাপারে শিক্ষা নিতে পারি। ২০১৪ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে যে পাঁচটি – রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল সিলেট ও গাজীপুর – সিটি করপেরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার সবগুলোই মোটামুটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হয়েছিল এবং এগুলোর সবগুলোতেই বিরোধী দল বিএনপির মেয়র প্রার্থীরা ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর এসব নির্বাচনের ফলাফল যে বার্তা বহন করেছিল তারই পরিণতি ছিল একতরফা দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

এছাড়াও আমাদের বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোও – যে কাঠামোতে সংসদ নির্বাচন হবে সংসদকে বহাল রেখে এবং দলীয় সরকারের অধীনে – সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে একটি পর্বত প্রমান বাধা। এ বাধার বড় কারণ হল আমাদের প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে ব্যপক দলীয়করণ, যা দিন দিন নগ্ন থেকে নগ্নতর হয়েছে। তাই অতীতে আমাদের দেশে দলীয় সরকারের অধীনে যত নির্বাচন হয়েছে, তার সবগুলোতেই ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। এছাড়া উচ্চ আদালতসহ আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুরাবস্থাও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে আরেকটি বড় বাধা। সুতরাং আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে এবং নির্বাচনকালীন সরকার ও সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া সম্পর্কে একটি ঐক্যমত্যে না পৌঁছলে, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে তার নিশ্চয়তা কোনোভাবেই দেওয়া যায় না।

আগামী নির্বাচনগুলোকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করার লক্ষে নির্বাচন কমিশনের আরও কিছু করণীয় রয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গন যদি পরিচ্ছন্ন না হয় এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা যদি নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় না নামে, তাহলেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পাওয়ার আশা হবে দুরাশামাত্র। একইসঙ্গে টাকার খেলার অবসান না ঘটলেও – যে টাকার খেলা আমাদেরকে 'টাকা দিয়ে কেনা যায় এমন উত্তম গণতন্ত্র' (best democracy money can buy) উপহার দেয় – আমাদের ভবিষ্যত নির্বাচন সুষ্ঠু ও অর্থবহ হবে না। তাই নির্বাচন কমিশনকে ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলোতে টাকার প্রভাব হ্রাস করার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

নির্বাচনী অঙ্গনকে পরিচ্ছন্ন করতে হলে পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদেরকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে আসার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এলক্ষে হলফনামার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার কমিশনের হাতে রয়েছে। আইনি বিধান অনুযায়ী, হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিলে কিংবা এতে তথ্য গোপন করলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হতে পারে। আর হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিয়ে নির্বাচিত হলে সে নির্বাচনও বাতিল হতে বাধ্য। এছাড়াও হলফ করে মিথ্যা তথ্য দেওয়া দণ্ডবিধির অধীনে একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই কমিশন হলফনামার তথ্য যাচাই-বাছাই করে কিছু ব্যক্তির নির্বাচন বাতিল করলে আমাদের নির্বাচনী মাঠ থেকে অনেক অবাঞ্চিত ব্যক্তিরা বিতাড়িত হবেন এবং আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন কলুষমুক্ত হবার পথ সুগম হবে। আর রাজনৈতিক অঙ্গন পরিচ্ছন্ন হলেই টাকা ও পেশী শক্তির মালিক তথা অবাঞ্চিত ব্যক্তিরা নির্বাচনী মাঠ থেকে ছিটকে পড়বেন। এ লক্ষ্যে 'বিরুদ্ধ হলফনামা' দাখিল সম্পর্কেও জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

নির্বাচনী মাঠ তথা রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে অবাঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে বিতাড়িত করতে হলে নির্বাচন কমিশনকে আইন ও বিধি-বিধান প্রয়োগেও কঠোরতা প্রদর্শন করতে হবে। যেমন, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং বিদেশী শাখা বিলুপ্ত করতে হবে। নির্বাচনী অপরাধ ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়েরের অপেক্ষায় না থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে কমিশনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচন কমিশন একটি সার্বক্ষনিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, যার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান। তাই বিধি-বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কারো অভিযোগের অপেক্ষা না করাই কমিশনের দায়িত্ব। একইসঙ্গে নির্বাচনের সময়ে কোনো অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠলে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করার পরও তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, এমনকি নির্বাচন বাতিল করার ক্ষমতাও কমিশনকে প্রয়োগ করতে হবে। তাহলেই দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হবে এবং সুষ্ঠু, নিরপক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথ সুগম হবে।

প্রবন্ধটি ১১ জানুয়ারি ২০১৮, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত